মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, মে ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ়, সাহসী নেতৃত্ব আর দূরদর্শী রাজনৈতিক পদক্ষেপের ফলে বাংলার সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর নানা চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে পথচলার কঠিন সময়ে ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট এবং ১৯৯৬ সালে সেগুন বাগিচায় ভাড়া বাড়িতে উদ্বোধন হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। আটজন ট্রাস্টির উদ্যোগে গৃহীত এই আয়োজনে সমর্থন যোগান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষেরা এবং সূচনা থেকেই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর বোন শেখ রেহানা। প্রতিষ্ঠালগ্নে জাতির পিতার স্মৃতিবিজড়িত অমূল্য কতক স্মারক প্রদান করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যাদ্বয়। জাদুঘর সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করলে প্রথম সদস্যপদ গ্রহণ করেন তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী ভবন নির্মাণে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা সদা বহমান।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ এপ্রিল ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য ডা. সারওয়ার আলী, মফিদুল হক, আসাদুজ্জামান নূর এমপি এবং ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে। গণভবনে অনানুষ্ঠানিক এই সভায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাদুঘরের নানামুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ডের বিশেষত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তা আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং স্থায়ী তহবিল গঠনে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশের জনগণের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অসাধারণ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক : আফরিন আখতার

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহকারী উপসচিব Ms. Afreen Akther ১২ মে ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। জাদুঘরে তাকে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। শিখা চির অম্লানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে তিনি জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় ট্রাস্টি মফিদুল হক তাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরুর কথা এবং দীর্ঘ দিনের পথ চলার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা এবং গণহত্যার স্বীকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মিস আফরিন আখতার ঘণ্টাব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারিসমূহ ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একই সাথে একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাপ্রবাহ এবং সেই সময়ে বাঙালি জনগণের অভিজ্ঞতা ধারণ করে চলছে। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য বাঙালির ইতিহাস তাকে উদ্বুদ্ধ করে। পরিদর্শন শেষে তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশের জনগণের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অসাধারণ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক।

সংবাদ সংস্থা ইউএনবি পরিবেশিত সংবাদভাষ্যে বলা হয়-

Resilience of Bangladeshi people very powerful, inspiring: US DAS Afreen Akhter

US Deputy Assistant Secretary of State Afreen Akhter has said the resilience of the Bangladeshi people is very powerful and inspiring. While visiting the Liberation War Museum, she said the Museum movingly conveys both the facts of that period as well as a sense of what Bangladeshis experienced during that time.

"It's an honour to have the opportunity to learn more about Bangladesh's struggle for freedom and democracy," Afreen said.

She appreciated the experience and thanked the staff for providing an excellent tour.

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল সভা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও শান্তি অধ্যয়ন

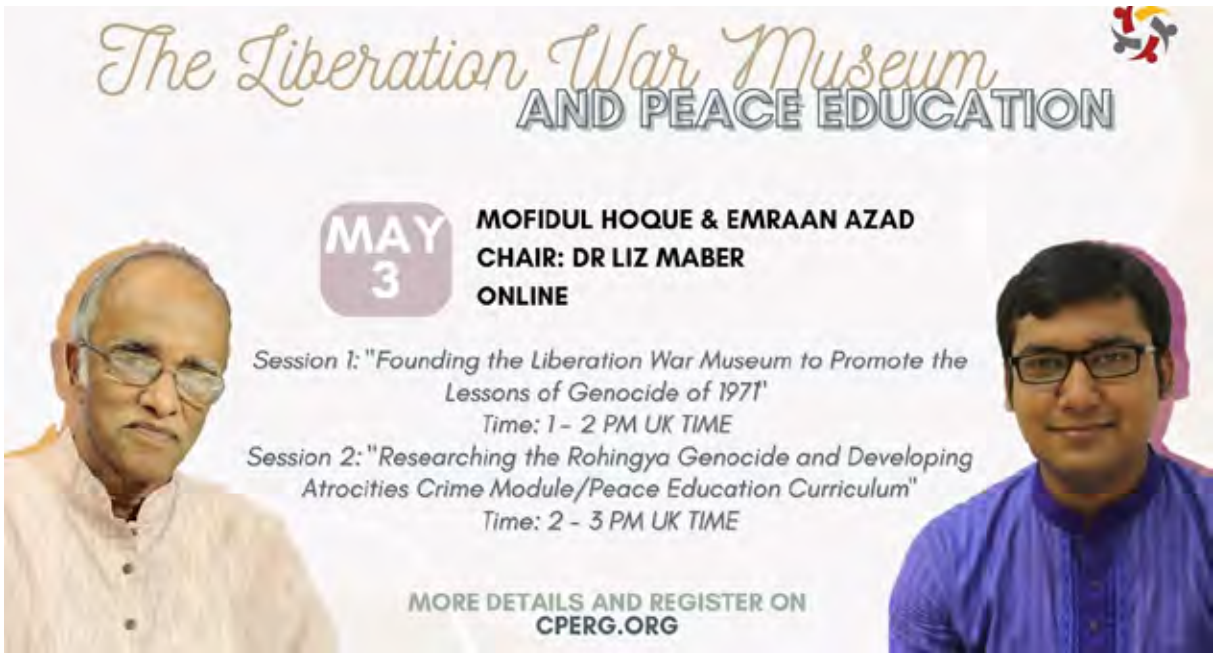

গত ০৩ মে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস এন্ড এডুকেশন রিসার্চ গ্রুপ (সিপিইআরজি) আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর সম্বনয়ক ইমরান আজাদ পৃথক দুইটি সেশনে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের জেনোসাইড, জেনোসাইড পরবর্তী বাংলাদেশে বিচার-প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টা ও সংকটসমূহ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে সামাজিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা, জাদুঘরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এবং সাম্প্রতিককালে রোহিঙ্গা জোনোসাইড গবেষণায় যুবসমাজের অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনার শুরুতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনের সভাপতি অধ্যাপক হিলারি ক্রেমিন সূচনা বক্তব্যে বলেন, ২০১৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে তিনি প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসেন জেনোসাইড বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে। তখন বাংলাদেশ জেনোসাইড সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হন এবং একইসাথে সম্মেলন শেষে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে গিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেকের সাথে কথা বলার সুযোগ পান। পুরো ঢাকা সফরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আথিয়েতায় বিশেষ করে জোনোসাইড গবেষণায় তরুণদের সম্পৃক্ততা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ জেনোসাইড বিষয়ক গবেষণায় শুধু নয়, শান্তি ও মানবাধিকার শিক্ষা সম্প্রসারণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে।

প্রথম সেশনে মফিদুল হকের আলোচনার বিষয় ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের মূল্যবোধ ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা। তিনি আলোচনা শুরু করেন মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। তিনি বলেন, মূলত ১৯৪৭-এর দেশভাগের বা ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘটনায় লুকিয়েছিল বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সেটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আর নীপিড়ন তথা ঔপনিবেশিক আচরণে । পাকিস্তানের মতো ধর্মান্ধ রাষ্ট্রের ধারণার সাথে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তা ধারণার কোনো সাদৃশ্য যে ছিল না, তা প্রমাণিত হয় বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নের ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স এগেইনস্ট মাস অ্যাট্রোসিটি ক্রাইমস এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ আয়োজন

ঘৃণাত্মক বক্তব্যের প্রচার প্রতিরোধ বিষয়ক ছয়-দেশীয় কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) গত ৩ মে ২০২৩ 'গ্লোবাল অ্যাকশন এগেইনস্ট মাস অ্যাট্রোসিটি ক্রাইমস'-এর সহায়তায় 'দ্য হেইট স্পিচ : কান্ট্রি রিপোর্ট-এর উপর একটি হাইব্রিড কর্মশালা আয়োজন করে। এই কর্মশালায় জাদুঘরের সেমিনার হলে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য দক্ষিণ এশিয়ায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ফলাফল প্রচার করা এবং এক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ।

এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়ার্কিং গ্রুপ (APWG) ২০১৮ সালে গ্লোবাল অ্যাকশন এগেইনস্ট ম্যাস অ্যাট্রোসিটি ক্রাইমস (GAAMAC) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২২ সালে এটি 'ঘৃণাত্মক বক্তব্য, উস্কানি এবং বৈষম্য প্রতিরোধ : সহনশীলতা এবং বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমন্বয়' শীর্ষক এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের প্রতিবেদন তৈরি করেছিল। প্রতিবেদনে ছয়টি দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৪০ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনের সূচনায় APWG-এর সহ-সভাপতি সেসিলিয়া জ্যাকবের একটি ভূমিকা রয়েছে যা ঘৃণাত্মক বক্তব্যের ধারণা এবং নৃসংশ সহিংসতার সাথে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে, এর প্রতিরোধ কৌশলগুলোর মধ্যে ঘৃণামূলক বক্তব্য, উস্কানি এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টাকে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করে। APWG-এ রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য ৫ এবং ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ব্যাংকক এবং জাকার্তায় দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা মূল বিষয়গুলিকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পরিসর তৈরি করেছিল। অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালা আয়োজনের জন্য APWG-এর সদস্যদের এবং GAAMAC-এর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ততার জন্য তাদের আগ্রহের ইঙ্গিত দেন। আরও দেশকে প্রচার ও অংশগ্রহণের প্রচেষ্টায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তাও ব্যক্ত করা হয়। পূর্ববর্তী কর্মশালার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং APWG দক্ষিণ এশিয়ায় হেট স্পিচ কান্ট্রি রিপোর্ট প্রচারের জন্য ৩ মে ২০২৩ এই হাইব্রিড কর্মশালাটির আয়োজন করে।

কর্মশালাতে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ভারত ও পাকিস্তান এই ছয়টি দেশের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ফিলিপাইন থেকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন Gani Abunda, ইন্দোনেশিয়া থেকে Alif Satria এবং মালয়েশিয়া থেকে Ruji Auethavornpipat। মায়ানমারের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয় অধ্যাপক Noel Morada। ভারতের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন Cecelia Jacob এবং পাকিস্তান থেকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন Hafizah Rashid। কেস স্টাডিসহ প্রতিবেদনগুলো উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস-এর আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সিএসজিজের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ। GAAMAC-এর সদস্য ভারতের মনিপুরের হিউম্যান রাইটস অ্যালার্ট (HRA) এর বাবলু লোইটংবাম সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধিরা অনলাইনে এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ছয়টি দেশের গবেষকরা হেট স্পিচ বা ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ঘৃণা ও বৈষম্যের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, সহনশীলতার প্রচার, ঘৃণাত্মক বক্তৃতা প্ররোচনা এবং বৈষম্য প্রতিরোধে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে, ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ের দায়-দায়িত্বসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সমাপনী বক্তব্যে হিউম্যান রাইটস এলার্টের নির্বাহী পরিচালক বাবলু লোইটংবাম আয়োজকসহ সকলকে একটি সফল কর্মশালা পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে কর্মশালাটি আরো উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

লামিয়া আফরোজ রিহা
স্বেচ্ছাসেবক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী জেনোসাইড অধ্যয়ন ফেলোশিপ

১৫ এপ্রিল ২১০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কম্বোডিয়ায় গবেষণার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে গবেষক তাবাসসুম নিগার ঐশী ও তাবাসসুম ইসলাম তামান্না

সিএসজিজে গবেষণা সহকারী তাবাসসুম নিগার ঐশীর কম্বোডিয়ায় গবেষণা অধ্যয়ন

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অপরিসীম অবদানের কারণে। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ কোভিড মহামারী চলাকালীন করোনা আক্রান্ত অবস্থায় জিয়াউদ্দিন তারিক আলী দেহত্যাগ করেন। জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসায়েন্সের যৌথ আয়োজনে ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে গণ-নৃশংসতা অপরাধের অধ্যয়ন, স্মৃতি-সংরক্ষণ এবং ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে এর প্রতিরোধের বিষয় কেন্দ্র করে 'জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ফেলোশিপ ২০২৩'-এর যাত্রা শুরু হয়। তিন মাসব্যাপী এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামে প্রথম এক মাস ফেলোরা একজন সিনিয়র মেন্টরের অধীনে বাংলাদেশে থেকে একটি গবেষণা প্রস্তাব তৈরি এবং দুই দেশের ঐতিহাসিক বিষয়, কম্বোডিয়ান গণহত্যার পটভূমি ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বইপত্র পাঠ করেন। পরবর্তীকালে ১-৩১ মার্চ বাংলাদেশ-কম্বোডিয়া জেনোসাইড বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণার জন্য ফেলোশিপে প্রথম দফায় গবেষণা সহযোগী তাবাসসুম নিগার ঐশী এবং তাবাসসুম ইসলাম তামান্না কম্বোডিয়ায় ক্ষেত্র গবেষণা করেন।

১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশন এবং অন্যান্য মানবাধিকার কনভেনশন গৃহীত হওয়ার পর বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া উভয়েই ১৯৭০-এর দশকে গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেছে। তাবাসসুম নিগার ঐশীর গবেষণার বিষয় 'বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার নৃশংস অপরাধের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ট্রানজিশনাল জাস্টিসের ভূমিকা'। বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়া, আজ অবধি ১৯৭০-এর দশকে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার অপরাধের জন্য ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ঐশীর গবেষণার একটি দিক হলো দুই দেশের সরকার এই নির্মম গণহত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার, পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বিধ্বস্ত জীবনের পুনর্গঠনের জন্য যে উত্তরণকালীন ন্যায় প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি বা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এবং তা কতটা ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করেছে - তা অনুসন্ধান করা। তা এছাড়াও, ঐশীর গবেষণার আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ হলো: (ক) বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার গণহত্যার কোন কারণগুলো উভয় দেশে বিচার বিলম্বের কারণ হয়েছে, তা খুঁজে বের করা; এবং (খ) সংঘটিত অপরাধের জবাবদিহিতার জন্য বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার সত্য ও সমঝোতা বাস্তবায়ন করা উদ্যোগগুলোর কোনো তাৎপর্য রয়েছে কি-না, তাও সন্ধান করা।

গত ১-৩১ মার্চ কম্বোডিয়ায় তারা বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান এবং গবেষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং এর পাশাপাশি মেমোরিয়াল সাইটগুলো পরিদর্শন করেন। স্থানীয় আয়োজক সংগঠন 'ইয়ুথ ফর পিস'-এর বিভিন্ন প্রোগ্রাম, যেমন- আন্তপ্রজন্ম আলোচনা, শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ, খেমার রুজ শাসন থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। উপরন্তু, ২৫ শে মার্চ, গণহত্যা দিবসে, কম্বোডিয়ার এক দল নবীন প্রজন্মের কাছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদানের মাধ্যমে দিবসটি স্মরণ করেন। এছাড়াও, ভিকটিমস সাপোর্টের প্রধান মি. হ্যাং ভান্নাকের এবং মি. পিচ আং, ন্যাশনাল সিভিল পার্টি লিগ্যাল ডকুমেন্টেশনের সহ-আইনজীবীর সাথে ফেলোরা বৈঠক করেন। বৈঠকের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন কম্বোডিয়ার সংঘর্ষ পরবর্তী পরিস্থিতি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিগত তিরিশ বছরে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। কম্বোডিয়ার দ্বন্দ্ব-পরবর্তী ন্যায়বিচার সম্পর্কে আরও জানতে ফেলোরা হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সংগঠন ও বোফানা অডিওভিজ্যুয়াল রিসোর্স সেন্টারের প্রধানের সাথে কথা বলেছেন। পরিদর্শন এবং সাক্ষাৎকারগুলো থেকে তারা বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার গণহত্যার প্রেক্ষাপটের মধ্যে যেই মিল ও অমিল রয়েছে এবং ভবিষ্যতে দুটো দেশে ট্রানজিশনাল জাস্টিসের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখছে তা নিয়ে গভীর ধারণা অর্জন করে।

গত ১৫ এপ্রিল ফেলোরা তাদের কম্বোডিয়ায় অধ্যয়ন সাফল্যের উপর একটি উপস্থাপনা করেন এবং যথা শীঘ্র সম্ভব তাদের ফেলোশিপের থিমের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

সিএসজিজে গবেষণা সহকারী তাবাসসুম ইসলাম তামান্নার কম্বোডিয়ায় গবেষণা অধ্যয়ন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর স্মরণে ২০২২ সালের অক্টোবরে একটি ফেলোশিপ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে তাবাসসুম ইসলাম তামান্না এই ফেলোশিপ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। বাংলাদেশে থাকাকালীন, তাবাসসুম ইসলাম তামান্না, তার গবেষণা প্রস্তাব প্রণয়ন ও সংশোধনের কাজ করেছে এবং কম্বোডিয়া সফরের সময় পরিদর্শন করার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করেছে। ফেলোশিপটি নৃশংস অপরাধের স্মৃতিচারণ ও সংরক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। এইভাবে, তামান্না তার গবেষণাটি বিশেষভাবে নৃশংস অপরাধের নথি দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং তার উপর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার উপর নিবদ্ধ করেছে।

প্রাথমিকভাবে তামান্না মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তার গবেষণা অধ্যয়নে পঠন সামগ্রীর মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়েছে। খেমের রুজ ইতিহাস জানতে বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট অধ্যয়ন করতে হয়েছে তাকে। তামান্না আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ (আইসিটি-বিডি) পরিদর্শন করেছে এবং বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন ব্যবহৃত দলিলপত্র নথি সংরক্ষণ এবং অধ্যয়ন সম্পর্কিত তার গবেষণার জন্য সম্মানিত বিচারকদের সাথে আলোচনা করেছে।

কম্বোডিয়ায় গবেষণা অধ্যয়ন এবং ক্ষেত্র পরিদর্শন ১ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বধ্যভূমি, নির্যাতন-কেন্দ্র ও জাদুঘর পরিদর্শন, গবেষণা অধ্যয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা। যে জায়গাগুলোতে যেতে হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, টুওল স্লেং জেনোসাইড মিউজিয়াম এবং চোয়েং এক কিলিং ফিল্ড, মেমোরিয়াল স্তুপা, বোপানা সেন্টার, বাটামবাং টর্চার হাউস মিউজিয়াম ও সামরোংকনং। ভিকটিমস সাপোর্টের প্রধান মি. হ্যাং ভান্নাকের এবং মি. পিচ আং, ন্যাশনাল সিভিল পার্টি লিগ্যাল ডকুমেন্টেশনে সহ-আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

কম্বোডিয়ায় অবস্থানকালে তাবাসসুম ইসলাম তামান্না ইয়থ ফর পিস সংস্থার বাংলাদেশের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের গণহত্যা দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন।

সিএসজিজে স্বেচ্ছাকর্মীদের ব্যাতিক্রমী আয়োজন

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অধীনে একটি সংস্থা যা বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি এবং বিশ্বজুড়ে নৃশংস অপরাধ প্রতিরোধে নিবেদিত। এই মিশনের জন্য তারা একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমর্থন করে। এ লক্ষ্যে তারা কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তায় অনেক কর্মসূচি পালন করে। স্বেচ্ছাসেবকদের একে অপরকে জানতে এবং তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে অনেক অফিসিয়াল প্রোগ্রামের পাশাপাশি তারা অনানুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানও করে থাকেন।

৬ই মে ২০২৩ গণহত্যা ও বিচারের অধ্যয়ন কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ক্যাফেটেরিয়ায় একটি বার্ষিক 'ওয়ান ডিশ পার্টি' আয়োজন করে। কর্মদিবসের পর, স্বেচ্ছাসেবকরা, কেন্দ্রের সহযোগী এবং জাদুঘরের কর্মীদের সাথে বিকাল ৩টায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ক্যাফেটেরিয়াতে একত্রিত হন এবং তাদের সাথে পার্টিতে উপস্থিত সকলের জন্য প্রস্তুত করা সুস্বাদু খাবার নিয়ে আসেন। সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর জন্য এটি একটি সুন্দর দিন ছিল।

ঐ দিন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই শুরু হওয়া বৃষ্টি পরিবেশটিকে ডিশ-পার্টির্র জন্য উপযুক্ত করে তুলেছিলো। উক্ত ডিশ পার্টির একটি দারুণ বিষয় ছিলো, উপস্থিত সকলে নিজ উদ্যোগে পানীয়সহ খাবার এবং মিষ্টান্ন নিয়ে আসেন। অনেক স্ন্যাকসও ছিল। অংশগ্রহণকারীরা সুস্বাদু খাবার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মুগ্ধ হয়েছিল। সদস্যরা ভোজসভায় অংশ নিয়েছিলেন এবং চারিদিকে আনন্দের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। নুডুলস, পাস্তা, সমোসা, বিভিন্ন ধরনের কেক, স্যুপ, মিষ্টি, গ্রিন ম্যাঙ্গো, কুকিজ, আইসক্রিম, ওন্থন, কোমল পানীয় এবং লেবুপানি প্রচুর পরিমাণে ছিল। অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সাথে এবং নিজেদের প্রস্তুত করা খাবার একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করে খেয়ে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে এবং আড্ডায় মেতে ওঠে।

অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য দিনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দ দায়ক। গণহত্যা ও বিচার অধ্যয়ন কেন্দ্রের স্বেচ্ছাকর্মী ও জাদুঘরের কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পাঠক প্রতিক্রিয়া

এপারে ভেসে আসা ওপারের বার্তা

পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে বসে ঢাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা পাই গত তিন বছর ধরে বাংলাদেশের এক শুভানুধ্যায়ী ভগ্নীর সৌজন্যে। প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে মনে হয়েছিল

"টান মেরে খুলে দিলাম জানালা
ওপারে যে বাংলাদেশ এপারেও সেই বাংলা"

পূর্বপুরুষের ভিটা বাংলাদেশে এখনো ভ্রমণ করতে পারিনি। কিন্তু উন্মুখ চিত্তে উদগ্রীব হয়ে আছি 'গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ' যাবো কবে? এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে আমার গহন মানসে বাংলাদেশের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার অনুপম অস্তিত্ব টের পাই। এই পত্রিকা সেই আয়না যাতে বাঙালি জাতিসত্তার উত্থান টের পাই।

আমার মত একজন তুচ্ছমাপের বাংলাদেশপ্রেমী মানুষ বাঙালির নিজস্ব দেশ, তার রবীন্দ্র-নজরুলকে বক্ষে ধারণ করে বাংলাদেশের দুর্বার অগ্রগতির দিকে গভীর শ্রদ্ধায় তাকিয়ে থাকে, কেননা পৃথিবীর ইতিহাসে তো ভাষার দাবীতে একটি দেশের জন্ম এর আগে কখনো হয়নি, পরেও কি কখনো হবে? বাংলাদেশের নাগরিকেরা আমার কল্পিত আত্মীয়। বায়োলজিক্যাল রিলেশন না থাকলেও এতে এতটুকু খাদ নেই। আর বাংলাদেশের ভাষা-সৈনিকদের আত্মত্যাগ, আত্ম-বলিদান, অসংখ্য মা-বোনের চরম অবমাননা মনে করিয়ে দেওয়ার ধৃষ্ঠতা আমার নেই। বরং নিজেকে চেতনা প্রদীপ্ত করার চেষ্টা করি আলাউদ্দিন আল আজাদের শহিদ মিনার ধ্বংস হওয়ার তীব্র শোক ও যন্ত্রণামথিত হয়ে কলমরূপ আমি তুলে নিয়ে বেদনাবহ কাব্যময়তায়–

"স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয়কি বন্ধু, আমরা এখনও
চার কোটি পরিবার-
খাড়া রয়েছি তো! যে ভিত কখনো কোন রাজন্য
পারেনি ভাঙ্গতে"

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অমর শহিদদের কথা। একই সঙ্গে এই পত্রিকার ভাবনার গভীরে অবতল থেকে উঠে আসে সোনালী স্বপ্নিল উজ্জ্বল এক বাংলাদেশের কথা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' রবি ঠাকুরের পূর্ববঙ্গ স্মৃতি লালিত এই জাতীয় সঙ্গীতে গাঢ় শাস্ত্র অথচ কি মিষ্টি সুরেলা সাঙ্গীতিক পরশ! একটি অভিনব প্রচেষ্টা দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে কোণায় কোণায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে পৌঁছে দেওয়া। এর সঙ্গে জাদুঘরকে বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া, নানা প্রকৌশলের ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত কোন সন্দেহ নেই গঠনমূলক। তাজউদ্দিন আহমদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি একই সঙ্গে আমার মনকে বিষণ্ন ও ভালোবাসাময় করে তোলে।

মুনীর চৌধুরী ও শহীদুল্লা কায়সারদের গুম খুন করে দেওয়া হয়েছিল, আরো লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মতন জহির রায়হানকেও কি ভুলতে পারি?

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি'?

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাণভোমরা কি এই দুটি লাইনের মধ্যে নেই?

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা মানে, শহিদ স্মরণ, পত্রিকার বার্তাকে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পৌঁছে দেওয়া, মানবিক নীতিমালা ঘোষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি মানবিক সংবেদনা ও সাহায্য প্রদান। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ, আহত যোদ্ধাদের প্রতি দরদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া চিকিৎসার ইতিহাস। জাদুঘর বার্তা মানে, 'শোক থেকে শক্তি' আহরণ। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মারক সযত্নে রক্ষা করা ভাবীকালের মানুষদের জন্য। তরুণ গবেষকদের অদম্য পরিশ্রমে তেরশ্রী জনপদের গণহত্যার স্মৃতি উন্মোচন। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেলের 'দেশভাগ' নিয়ে চলচ্চিত্রায়ন ও মনোগ্রাহী আলোচনা। জাদুঘর বার্তা মানে, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও তাঁর প্রামানিক দলিল সঙ্গে নবীন আর প্রবীনের শপথ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা মানে, পত্রিকার অক্ষরে অক্ষরে লক্ষ লক্ষ প্রাণ, সম্ভ্রমহানির পরেও 'চির উন্নত মম শির' হয়ে উঠে দাঁড়ানো, অতীতের গ্লানি, শঠতা, প্রবঞ্চনা, বর্বরের অস্ত্রাঘাতে লুটিয়ে পড়তে পড়তেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর গৌরবময় অভিযাত্রা সঙ্গে করে পাকসেনার আত্মসমর্পণ, খুনী জেনারেল নিয়াজীর বন্দীত্ব ৯৩ হাজার সৈন্যসহ।

শুধু মনে পড়ে বারেবারেই যে নবযুগের যাত্রা পথে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে তাতে সেই বালিকাও তো সামিল হতে পারতো যার শোচনীয় নিহত হওয়ার পর পরিধেয় একটি জামা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঠাঁই পেয়েছে এবং তার বাবা বছরে একবার ঐ জামার

সন্দীপ সিনহা রায়

সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে হয়তো অশ্রু মোচন করেন। আমরাও কি করি না?

কালের নিয়মে সম্প্রতি অরূপলোকে যাত্রা করলেন প্রতিষ্ঠাতা তিনজন ট্রাস্টি সদস্য রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী এবং আলী যাকের। তাদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি।

আগুনপাখির বৃদ্ধা গৃহকর্তী বলেছিলেন 'আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না যে সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার দ্যাশ নয়' তিনি অপেক্ষা করেছিলেন নতুন সকালের, স্নিগ্ধ আলোর যখন তিনি পূর্বমুখো করে বসবেন আর চেয়েছিলেন সবাইকেই বুকে টেনে নিতে। তিনি একা হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীলের অনবদ্য অনুভব 'ভুল করে মূল হারাইয়ো না'।

কাঁটাতারের বিভাজন নিতান্ত প্রত্যক্ষগোচর একটি রাজনৈতিক ভাবনা, ব্যবস্থা। এই বিভাজন সত্বেও আমরা এপার ওপারের অভিন্ন হৃদয়ের গহন মানসে হাসিতে, গানে, কথায়, ভালবাসায়, মননে রবিঠাকুর নজরুলের চরণাশ্রিত ছিলাম, থাকবো আরও বহু বহু যুগ ধরে।

সন্দীপ সিনহা রায়

শহিদ পরিবারের স্মৃতিকথা : শহিদ কর্নেল সৈয়দ আব্দুল হাই

আমি শহিদ কর্নেল সৈয়দ আব্দুল হাই-এর স্ত্রী নাসিম হাই। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের একদম শুরুতে আমার স্বামী ৩০ মার্চ শহিদ হয়েছিলেন যশোর ক্যান্টনমেন্টে। আমার তিন ছেলে নিয়ে আমরা তখন ক্যান্টমেন্টের একই বাসায় ছিলাম। তার আগে ১৩ মার্চ আমরা ঢাকা থেকে ছুটি শেষে যশোর এসেছিলাম। আমার আব্বা মারা গিয়েছিল বলে চল্লিশ দিন আমি আমার মায়ের বাসায় ছিলাম। এসময় আমার স্বামীও ঢাকায় এসছিলেন ছুটিতে। তখন তিনি জেনারেল ওসমানী ও কর্নেল রবের সাথে দেখা করেন। ওসমানী সাহেবও আমাদের ধানমন্ডির বাসায় এসেছিলেন। তখন খবর পাওয়া গেলো পাকিস্তান থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আসছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম এই অস্ত্র আমাদের উপর ব্যবহার হবে। আমার স্বামী ওসমানী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন– আমাদের এখন কি করা উচিৎ। ওসমানী সাহেব বলেছিলেন, ধৈর্য্য ধরো ডায়রেকক্টিভ আসবে। ৭ মার্চের ভাষণের পর বিষয়টা আরও পরিস্কার হয়ে গেলো। যুদ্ধ অবসম্ভাবী। তো ১৩ মার্চ সকাল দশটার দিকে আমরা ঢাকা থেকে নিজেদের গাড়িতে করে যশোর ক্যান্টেনমেন্টের উদ্দেশে রওনা হলাম। গাড়িতে কালো পতাকা ওড়ানো হলো। তখন দেশের নানা প্রান্তে সাধারণ মানুষ প্রাণ দিচ্ছে। সেই শোকের কালো পতাকা ছিল ওটা। পথে পথে নানান জায়গায় পাকিস্তানি চেকপোস্টে গাড়ি থামানো হলো কালো পতাকা দেখে। পদ্মা নদীতে ফেরি পাড়ি দিয়ে আমরা যখন বিকেল চারটা নাগাদ যশোর ক্যান্টমেন্ট গেটে পৌঁছলাম ততোক্ষণে কালো পতাকার বিষয়ে খবর রটে গেছে একজন বাঙালি কর্নেল গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকেছে। সাধারণ সৈন্যদের উস্কানি দিচ্ছে। ওরা বললো কালো পতাকা নামাতে হবে। কর্নেল সাহেব তবুও কালো পতাকা নামালেন না। তিনি বলেন এটা আমাদের প্রদিবাদ। আমাদের নিরীহ মানুষ মারা হচ্ছে। আমরা কেন চুপ করে বসে থাকবো। পতাকা নামবে না। আমার বাসায় একদিন মেজর হাফিজসহ আরও কয়েকজন এলো। ওরা তখন সব ব্যাচেলর ছিল। আমরা বুঝতেও পারিনি সব কিছু সার্ভিলেন্স হচ্ছে। আমার মনে আছে আমরা একদিন মেজর জলিলের বাসায় গেলাম, ওনাকে বলার জন্যে। ওনার কাছে তখন যশোরের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবচেয়ে বড় ব্যাটেলিয়ন। কিন্তু আমরা বুঝলাম উনি তখনও ততোটা শক্তিশালী নন। আমার স্বামী যেহেতু ডাক্তার ছিলেন, তিনি মনে করতেন ডাক্তারদের ওরা কিছু করবে না। বেশি হলে জেলে দিবে। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ডাক্তারদের মারা হয়নি। এটাই নর্মস। ২৫ তারিখের পর আমরা গৃহবন্দী ছিলাম। আমার স্বামীর অফিসে যাওয়া নিষেধ ছিল। ৩০ মার্চ সকালে ফোন আসলো ওকে অফিসে যেতে হলো। ঢাকা থেকে অর্ডার আসলো কোষাগারের অস্ত্র জমা দেয়ার বিষয়ে। সামান্য কিছু অস্ত্র কোষাগারে ছিল। কিন্তু উনি আমাকে জানিয়ে গেলেন কোষাগারের চাবি তিনি দিবেন না। আর চাবি থাকতো সুবেদার মেজরদের কাছে। তিনি জানালেন তিনি চাবি জমা দিতে নির্দেশ দিবেন না। সৈনিকরা সিদ্ধান্ত নিবে চাবির কি হবে। সকাল সাতটায় উনি গাড়ি নিয়ে অফিস গেলেন। সাড়ে আটটার দিকে অডার্লি দৌড়ে বাসায় এসে জানালো– আম্মা বেলুচ রেজিমেন্ট তো আমাদের ইউনিটের ওপর আক্রমণ করেছে। আমার ছোট ছেলে দুটো কান্নায় ভেঙে পড়লো– আমার আব্বার কি হবে। যশোর ক্যান্টমেন্টে পুরাপুরি বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। আমার স্বামীর ইউনিটের নাম ছিল ফিল্ড এম্বুলেন্স। খুব সামান্য সংখ্যক সৈন্য তার। কিন্তু ওরা পলিটিক্যালি খুব সচেতন ছিল। আমার স্বামীর ইউনিটে থাকা সাধারণ সৈন্যরা জয় বাংলা শ্লোগান তুললো এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ালো। তারা চাবি দিলো না পাকিস্তানিদের হাতে। কিন্তু সামান্য সংখ্যক সৈন্য ও গোলাবারুদ। আমরাও বাসা থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি। ক্যান্টনমেন্টে তখন ৭৫ শতাংশ সৈন্য ছিল বেলুচ রেজিমেন্টের। ২৫ শতাংশ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ছিল ক্যান্টেমেন্টের বাইরে মেজর জলিলের অধীনে। তারাও সাহায্যের হাত বাড়ালো না। অনেক সৈন্য মারা গেলো। বারোটার দিকে ব্রিগেডিয়ার দুররানী এসে জানালো বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও উঠতে হবে। আমি বললাম আমি বাসা ছাড়বো না। আমার স্বামী আসুক। দুররানি চলে গেলো। বাসার ফোন বাজলো। আমার হাত কাঁপছে। ছেলেরা সবাই কাঁদছে, অডার্লিও কাঁদছে। ফোন ধরে শুনলাম কর্নেল সাহেবের ভয়েজ। তিনি জানালেন, এখানে অবস্থা ভালো না। প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে। লুক আফটার দা বয়েজ। আরেকটা কথা বললেন, পারলে ছেলেদের নিয়ে পালিয়ে খুলনা চলে যেয়ো। এই শেষ কথা। খুলনায় আমাদের আত্মীয়-স্বজন ছিল। কিন্তু কি করে পালাবো। বাসার চারপাশ বেলুচ রেজিমেন্ট ঘিরে রেখেছে। তারপর ব্রিগেডিয়ার দুররানি আবার এলো, বললো– ইউ হ্যাভ টু ইভাকুয়েট। আমাদের সব বাঙালি অফিসারদের বউ বাচ্চাদের একটা স্কুলে রাখা হলো। তিনটার পর লক্ষ্য করলাম গোলাগুলি থেমে গেছে। সন্ধ্যার সময় সিএমএইচ-এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল কুদ্দুস সাহেবের বাসায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ট্রাকে করে। একটু রাত হওয়ার পর কুদ্দুস সাহেব বাসায় এলেন। ওনার স্ত্রীর সাথে কথা বলে আবার চলে গেলেন বাইরে। এরপর একে একে অন্যদের স্বামীরাও আসলেন। আমার খুব রাগ হচ্ছিল আমার স্বামীর ওপর। আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি একটা খোঁজ নেয়ার দরকার বোধ করলো না। তখনও আমি ভাবতেও পারিনি এমন কিছু ঘটতে পারে। আমি ভাবছি, কাউকে কি পাঠাতেও পারেনি আমাদের খোঁজ নিতে। কাউকে পাঠাবে কি করে। আমি তো জানি না, ততোক্ষণে ওর সব সিপাহিরা মারা গেছে। যারা বেঁচে ছিল তারা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। ও-তো পালাতেও পারেনি। নিজের রুমেই বসে ছিল। রাত দশটার দিকে দেখি কয়েজন ভাবি কাঁদছেন। আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করি আপনারা কাঁদছেন কেনো। একজন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনার সাহেবকে ওরা মেরে ফেলেছে। আমি একদম কান্নাকাটি না করে পাগলের মতো বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলাম। বেলুচ রেজিমেন্টের সিপাহিরা আমাকে আটকে দিল। আমি ব্রিগেডিয়ার দুররানির সাথে কথা বলবোই বলবো। দুররানিকে ফোন দেয়া হলো। আমি বললাম, হোয়ার ইজ মাই হাজবেন্ড? দুররানি বললো, সরি হি ইজ ডেড। আমি বললাম, হোয়ার ইজ হিজ ডেড বডি। দুররানি বললো, আপনি ঢাকা চলে যান আমরা ডেড বডি পাঠিয়ে দেবো। আমি বললাম, আমাকে ডেড বডি না দিলে আমি রাস্তায় বসে থাকবো। আমাকে ট্রাক দিয়ে মেরে ফেললেও আমি উঠবো না। আই উইল কিল এভরি ওয়ান। তখন সে আমাকে বললো, ওকে কাম ডাউন। আর কিছু বললো না। রাতটা এভাবেই কাটলো। পর দিন সকালে একজন এসে বললো, আপনি বাসায় যান। আপনাকে ঢাকা যেতে হবে। আমি বললাম, আমি এখানে থাকবো না, ঢাকায় আমার মায়ের বাসায় চলে যাবো কিন্তু বডি না নিয়ে কোথাও যাবো না। কাছেই আমর বাসা ছিল। বাসায় গিয়ে শুধু কাপড়টা পরেছিলাম। আর বোধ হয় ওয়াশ রুমে গিয়েছিলাম। আর কিচ্ছু করলাম না। টাকা পয়সা আসবাবপত্র সব পড়ে রইলো। আমাদেরকে যশোর এয়ারপোর্টে আনা হলো। আমি আমার তিন ছেলে আর অর্ডালি। অর্ডালি বললো, আম্মা আমি আপনাদের সাথে যাবো। আমি সেখানকার লোকদের বললাম ও আমাদের সাথে যাবে। আমার আত্মীয়। আমার বাসায় থাকে। ওখানে আগে থেকেই ডেড বডি রাখা ছিল। আমি কাঁদিও নাই। আমি মনে করলাম লোক মারা শুরু করলেই দেশ স্বাধীন হবে। হয়তো আমার স্বামী মারা না গেলে অন্য কোন বোনের স্বামী মারা যেতো। দেশ স্বাধীন হোক। রাত বারোটার পরে এম্বুলেন্স থেকে কফিন প্লেনে ওঠানো হলো। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা পোঁছে গেলাম। রাত দুইটা পর্যন্ত বিমানবন্দরে বসিয়ে রাখা হলো, তখনও বুঝিনি কারফিউ চলছে। রাত দুইটার পর কারফিউ শেষে আমাদেরকে ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডে আমার মায়ের বাসায় ডেড বডিসহ নিয়ে আসা হলো। আগে থেকেই ওদের লোক রেডি ছিল। আমাদের বাসার কেউ কিছু জানতো না। আমার ভাই এনাম চৌধুরী বললো, ডাক্তারকে তো মারে না। মা এম্বুলেন্স দেখে বেরিয়ে আসলো। বললেন– ওইতো ওরা চলে এসেছে। কাজের লোকেরা জানালো এম্বুলেন্সে দুলাভাইয়ের লাশ। ওরা সারারাত গার্ডে ছিল। পাকিস্তানিরা বললো কোন জানাজা হবে না লাশ দেখে আমাদের দিয়ে দাও আমরা যা করার করবো। ওরা হয়তো এমনি ফেলে দিতো লাশটা। আমাদের বাসার লোকজন কোনভাবেই ওদের কথা মানলো না। বললো– এটা আমাদের লাশ আমরা বুঝবো লাশের কি হবে, জানাজা আমাদের বাসায় হবে দরকার হয়। আজিমপুরে আমরাই লাশ দাফন করবো। আজিমপুরে আমার আম্মার নামে একটা প্লট কেনা ছিল। আম্মা বললেন, আমার প্লটে আমার জামাইকে দাফন করা হোক। আমাদের সব প্রতিবেশীরা জানলা দিয়ে দেখলো। কাউকে বের হতে দেয়নি। আমার এক চাচি শাশুড়ির বাসা ছিল ধানমন্ডিতে। আপন চাচিকে পর্যন্ত ওরা আসতে দেয়নি। লাশটা শেষবারের মতো দেখতে দেয়নি। ভোরবেলা আরও অনেক মিলিটারি এলো। ওদের পাহারায় লাশ আজিমপুর নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের লোকজন কবরের পাশে কোন রকম জানাজা পড়ে লাশ দাফন করলো। বাসার বাইরে আর্মির পাহারা ছিল তারপরও। এইভাবেই নয়টা মাস কাটলো। আমি একটা ফোটাও কাঁদিনি। প্রথম একবার কেঁদেছি, যখন মা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আর দ্বিতীয়বার কেঁদেছি যখন পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের ছবিটা দেখেছি ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। এছাড়া আমি একটা ফোটাও কাঁদিনি।

সাক্ষাৎকার : শরীফ রেজা মাহমুদ

এসওএস শিশুপল্লী, মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস-অনুসন্ধান

শ্যামলীর প্রধান সড়কের পাশে এস ও এস-এর লাল দেয়াল ঘেরা চমৎকার ভবন অনেকের নজর কাড়বে, তবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এর সম্পৃক্তি অনেকটাই অজানা। একাত্তরের বিজয়ের পর বাংলাদেশে এসেছিলেন দুই জার্মান নাগরিক, হারমেইন মেইনার ও হেলমুট কুটিন । যুদ্ধে পরিবারহারা অনাথ শিশুদের লালন ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা কাজ করেন এবং বাংলাদেশেও সেই লক্ষ্যে এস ও এস শিশুপল্লী প্রতিষ্ঠা করতে চান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করলে তিনি তাঁদের বিশেষ উৎসাহ দেন। সেই থেকে ছোট আকারে যুদ্ধে স্বজনহারা অনাথ শিশুদের জন্য তাঁরা বাংলাদেশে গড়ে তোলেন এসওএস শিশুপল্লী, আজও যার কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং অনেক প্রসারতা অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠাকালের ইতিহাসের তথ্য ও ভাষ্য সংগ্রহের জন্য এসওএস শিশুপল্লী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। নানাভাবে চলছে তথ্যানুসন্ধানের কাজ। সম্প্রতি ছুটির অবকাশে থাইল্যান্ড গিয়েছিলেন জাদুঘর-কর্মী রনিকা ইসলাম। যাওয়ার আগে আলোচনাকালে এসওএস শিশুপল্লীর পরিচালক এনামুল হক জানান, হেলমুট কুটিন বর্তমানে থ্যাইল্যান্ডে অবস্থান করছেন। রনিকা ইসলাম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বিশেষ উৎসাহ ব্যক্ত করেন। ব্যাংককের বাইরে যে শিশুপল্লীতে তিনি আছেন, সেখানে যাওয়ার জন্য তিনি গাড়ির ব্যবস্থা করেন। একঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে নেয়া সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণী দিয়েছেন রনিকা ইসলাম।

"এসওএস শিশুপল্লীর প্রতিষ্ঠাতা হারম্যান মেইনারের সহকর্মী ছিলেন হেলমুট কুটিন। ১৯৭২ সালে যুদ্ধ-শিশু ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য হারম্যান মেইনারসহ তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। সেই সফরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭২-এর পর মি: কুটিন ২০১৯ সাল পর্যন্ত বছরে একবার করে বাংলাদেশে আসতেন। করোনা পরবর্তী সময়ে বয়সের কারণে তিনি আর বাংলাদেশে আসেননি। মি. কুটিন-এর সাথে দেখা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে জানা, যুদ্ধশিশু এবং পুনর্বাসনের কাজ, পরবর্তী সময়ে তাঁর বাংলাদেশ সফর, সেই সময়ের কোন ছবি আছে কিনা এইসব বিষয়ে জানার আগ্রহ ছিল। সেজন্য বিগত ২৮ এপ্রিল ২০২৩ থাইল্যাণ্ডে মি. কুটিন-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করি। মি. কুটিনের কাছ থেকে দলিলপত্র তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি, তবে সেখানে অবস্থানের সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সফরকালে যে সকল এলাকায় গিয়েছেন তা বর্ণনা করেন। শিশুপল্লী প্রতিষ্ঠার কাজকর্ম বিষয়েও অবহিত করেন। সেই বর্ণনাটি রেকর্ড করে নিয়ে আসা হয়। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ গবেষণায় তা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে।"

রনিকা ইসলাম

'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও শান্তি অধ্যয়ন'

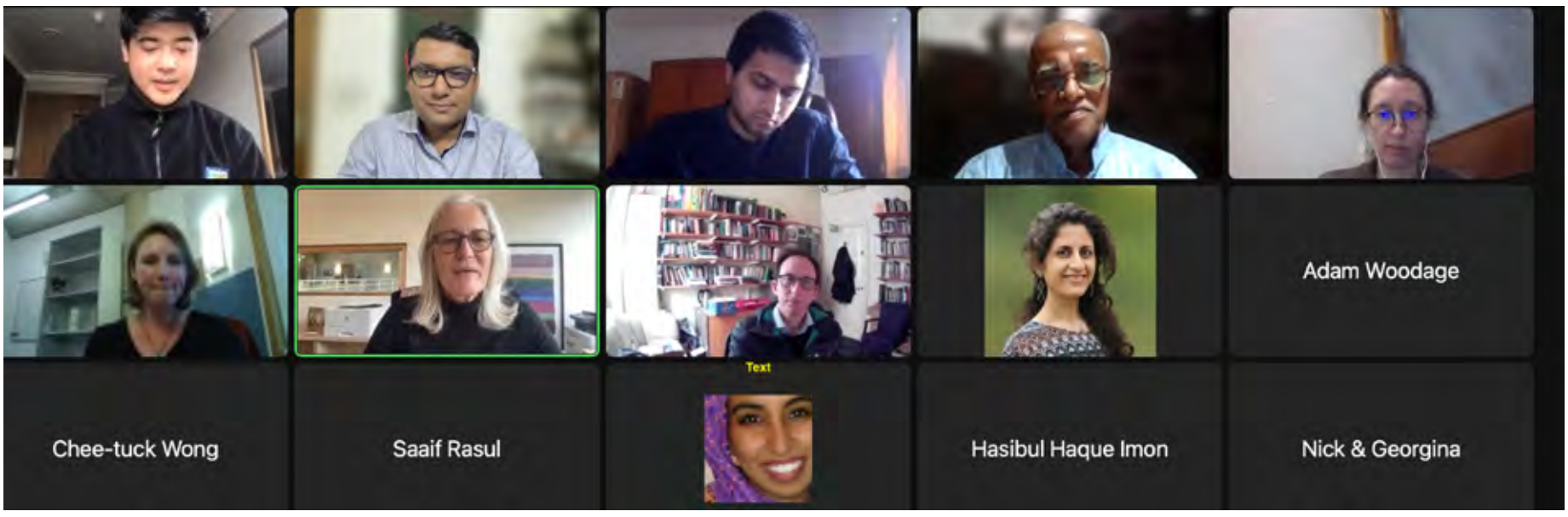

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি সত্তরের নির্বাচনের ফলাফলে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বাঙালি জাতীয়তাবোধের যে স্ফুরণ ঘটেছিল সত্তরের নির্বাচনের ফলাফলে, তা বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তথা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রকল্পের একটি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রকাশ ছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ তা আরো পরিস্কার করে তোলে। যাইহোক, ঘটনার পালাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ন্যায্যভাবে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর অন্যায্য যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, রাতের আধাঁরে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ন্যক্কারজনক বর্বরতম এক জোনোসাইড। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার আগেই ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুসংহত করেন। পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে জেনোসাইডের শিকার হওয়া মানুষ প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র তখন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি জোনোসাইড সংঘটনকারীদের পক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেসব রাষ্ট্রের সিভিল সোসাইটি আর সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়। লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে জনসভা করে, নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ারে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজন করে জোনোসাইড বন্ধের জন্য আহ্বান জানানো হয়। বিজয় লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। ১৯৭২ সালে দালাল আইন আর ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়ন করা হয় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে বাংলাদেশে বিচারহীনতার এক সংস্কৃতি শুরু হয়। এমন এক রাজনৈতিক আবহে ১৯৯৬ সালে আটজন মুক্তিযোদ্ধার পরিকল্পনায় ঢাকার সেগুনবাগিচায় একটি ভাড়া করা বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণার্থে গড়ে তোলা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তখন থেকে নানাজনের সম্পৃক্ততায় জাদুঘরের পরিসর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ২০১৭ সালে জাদুঘরটি আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ভবনে চলে আসে। যুবসমাজের অংশগ্রহণে জাদুঘরের কর্মীবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিয়মিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আলোচনা সভার দ্বিতীয় সেশনে ইমরান আজাদ কথা বলেন ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা জেনোসাইড গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের অংশগ্রহণ বিষয়ে এবং একইসাথে শান্তি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সেন্টারের ভূমিকা নিয়ে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সেন্টারটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একমাত্র গবেষণা ইউনিট, যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন দেশের জেনোসাইড নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেয়ে আসছে। রোহিঙ্গা জেনোসাইড গবেষণায় এখন পর্যন্ত দশবারের বেশি সময় সেন্টারের তরুণ গবেষকেরা কক্সবাজার ও ভাসানচর শরণার্থী শিবিরে গিয়েছে এবং রোহিঙ্গাদের মৌখিক জবানবন্দি বা ভাষ্য সংগ্রহ করেছে। যেগুলো বাছাই করার পর ২০১৭ সালে প্রথম 'টেস্টিমনি অব সিক্সটি অন দ্য ক্রাইসিস ইন নর্দান রাখাইন' নামে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে 'দ্য রোহিঙ্গা জেনোসাইড: কমপাইলেশন এন্ড এনালাইসিস অব সারভাইবরস টেস্টিমনিস' শীর্ষক আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। রোহিঙ্গা গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস, হার্ভাড ইউনিভার্সিটি এশিয়া সেন্টার, এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কাজ করে আসছে, বিশেষ করে তরুণ গবেষকদের রিসার্চ স্কিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সেন্টার এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধন নিয়ে 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লিবারেশন ওয়ার, পিস স্টাডিজ এন্ড এটরোসিটি ক্রাইমস প্রিভেনশন' শীর্ষক একটা চারমাসব্যাপী কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা করছে। ইতোমধ্যে ইউএন অফিস অন জেনোসাইড প্রিভেনশন এন্ড রেস্পনসিবিলিটি টু প্রটেক্টের সহায়তায় কোর্স কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে। মূলত সেন্টারের মাসব্যাপী সার্টিফিকেট কোর্স এবং সপ্তাহব্যাপী আবাসিক উইন্টার স্কুলের বৃহদায়তনে এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সটি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়ার বিধান রাখা হবে। সেশন দুইটি শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে মফিদুল হক এবং ইমরান আজাদ অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আলোচনা সভায় সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনের সহকারী অধ্যাপক এলিজাবেথ মাবের। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং এর সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত জেনোসাইড ও শান্তি শিক্ষা গবেষণায় অগ্রগামী ভূমিকা রাখছে।

সিএসজিজে প্রতিবেদন

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সিএসজিজে স্বেচ্ছাকর্মীদের ইন্টার্নশিপ

সম্প্রতি সেন্টার ফর দ্য স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর সহযোগিতায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ৩ মাসব্যাপী ইন্টার্নশিপের আয়োজন করা হয়। ২ জন অংশগ্রহণকারীর ইন্টার্নশিপ শুরু হয় ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে। প্রথম দিন নানা বিষয়ে ভয়-ভীতি কাজ করলেও ক্রমশই তা দূর হয়ে যায় একাডেমির কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনায়। এই ইন্টার্নশিপ আমাদের পুস্তকীয় জ্ঞানকে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক মহলে আলোচিত সবচেয় গুণী ব্যক্তিবর্গের অধীনে কাজ করতে পারার একটি বড় সুযোগ ছিল এই ইন্টার্নশিপ। ইন্টার্নশিপ চলাকালীন আমাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও অনুধাবনমূলক দক্ষতা বিকাশে সহযোগিতা করেছে। কিছু কিছু টাস্ক আমাদের জন্য ছিল একেবারেই নতুন। তন্মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সেমিনার ও প্রোগ্রামে অংশ নেয়া কিংবা রাষ্ট্রদূতদের সাথে আলাপচারিতা ইত্যাদি ছিল বেশ শিক্ষণীয়। আমাদের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি ছিল লাইব্রেরির বইয়ের ব্যবস্থাপনা এবং কোন বইয়ের প্রয়াজনীয়তা কতটুকু বেশি তা কর্তৃপক্ষকে জানানো। লাইব্রেরির এই কাজটি আমাদের জন্য সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ সেখানে ছিল সব ধরনের বইয়ের এক বিশাল ভাণ্ডার। বিভিন্ন বইয়ের সংগ্রহ ছাড়াও সেখানে ছিলো প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক ছবি। আমরা প্রায়শই বইগুলো পড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়েছি। এমনকি সুগন্ধা ও নতুন

বিল্ডিংয়ের সবগুলো পেইন্টিং একত্রিত করে একটি ইনভেন্টরি বানানোর সুযোগও হয়েছিলো যা ছিল এক ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা। এছাড়াও ফরেন সার্ভিস একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা শিখন' কোর্সের জন্য আমরা ইন্টার্ন হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল দূতাবাসে কোল্ড-কলিং করি, যার সুবাদে আমাদের সুযোগ হয়েছিলো বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে যোগাযোগ করার। তাদের সবার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। দাপ্তরিক কাজের বাইরেও পররাষ্ট্র একাডেমিতে ট্রেনিংয়ের জন্য অবস্থিত ফরেন ক্যাডার ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের ডিপ্লোম্যাটদের সাথে আমরা কিছু সেমিনারে অংশগ্রহণ করি, যার মধ্যে ইউএনওডিসি টাস্ক টিম দ্বারা নারকোটিক্স-স্মাগ্লিং নিয়ে আয়োজিত সেমিনারটি ছিল সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। এই সেশনগুলো সাম্প্রতিক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করেছিলো যা, আমাদেরকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাছাড়া মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত একাডেমির নিজস্ব প্রোগ্রামেও আমাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। সেমিনার আয়োজনপূর্বক তদারকির দায়িত্বেও আমরা ছিলাম। কাজ করার পাশাপাশি একাডেমির ভেতরে চাষ করা সব্জি দিয়ে বানানো খাবার সুগন্ধার বারান্দায় বসে খাওয়া ছিল অন্যতম এক অনুভূতি যা আমাদের সবসময় মনে থাকবে। বলা বাহুল্য, এই তিন মাস আমরা কাজ করেছিলাম 'বঙ্গবন্ধু ফরেন পলিসি রিসার্চ সেন্টার'-এ, যা ছিল ঠিক জেনোসাইড-কর্নারের পাশে অবস্থিত সুগন্ধার সবচেয়ে গোছানো রুমগুলোর একটি। এই ইন্টার্নশিপ আমাদেরকে নতুন অনেক কিছু শেখার সুযোগ দিয়েছে, যা পরবর্তী কর্মজীবনে আমাদের আরও দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ হতে সহায়তা করবে। বিশেষজ্ঞদের সাথে কাজ করে বাংলাদেশের ফরেন পলিসি ও ডিপ্লোমেসি নিয়ে আমরা নতুন অনেক কিছু জানতে পেরেছি। অফিসের কাজ করা নিয়ে আমাদের যেসমস্ত ভয়ভীতি ছিলো তা দূর করে কীভাবে বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো যায় এবং নমনীয় হওয়া যায় তা জেনেছি, পাশাপাশি সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা শিখেছি। সামগ্রিকভাবে, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর মধ্যস্থতায় আয়োজিত এই ইন্টার্নশিপ ছিল আমাদের জন্য একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

আহনাফ তাহমিদ অর্নব, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
তনিমা আক্তার জিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিঙ্গাপুরের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তান পিন পিন-এর ঢাকা ডায়েরি

এ বছর একাদশ লিবারেশন ডকফেস্টে বিচারক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরের খ্যাতিমান প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তান পিন পিন। উৎসবের শেষ দিকে ঢাকায় এসে এই নির্মাতা তার ছবির রেট্রোস্পেকটিভ অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। একটা প্রায় গোটা দিন অন্য দুই বিচারকের সাথে মিলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য সেরা ছবি বাছাই করেন। কিন্তু তারপরও সুযোগ পেয়ে ঢাকার নানাপ্রান্তে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ভ্রমণ করে সিঙ্গাপুরে ফিরে যান। পরবর্তীতে ফেসবুকে তার ঢাকা সফর নিয়ে ডায়েরি আকারে ছোট ছোট বয়ান তার তোলা ছবির সাথে তুলে ধরেন। কিছু নমুনা এখানে সংযুক্ত করা হলো–

Tombola night at Dhaka Club, the equivalent of our Cricket Club, mainly women in this huge hall. Women are rarely seen walking on the streets, on buses.
#dhakatrippin

Travelling around Dhaka, I kept an eye out for a respite from the intense traffic and pollution. I found such an oasis at the Faculty of Fine Art, Dhaka University. Walking around, peaking into classrooms, I spied a lovely pigeon cote. There is no canteen, food is served from huge basins, and the students eat on benches in the quads. This school has a strong focus on painting, a rare sight these days. It was designed in 1955 by Architect Muzharul Islam. #dhakatrippin

We arrived too early, about 10am, and found the mosque locked. An elderly neighbour took us round to the back to the iman's house. Mehedi knocked on the gate and mentioned across the courtyard that he had a visitor from Singapore. His wife said the iman wasn't home, to come back during the lunchtime prayers.
An hour later, rather than leave without seeing inside since we had come all the way from across town, I went over again and ask if she could help, and she sent someone to get the key from somewhere,

and a young man came to open the door for us. He asked "Are you an architect?". Marina Tabassum's Bait Ur Rouf Jame Mosque is sited in a quiet neighbourhood. It is a mosque for the community, it is made of very modest in materials, bricks, but its artistry and ambition is not modest. I wonder if the users found it too severe. too minimalist and monochromatic. Mehedi Mostafa said it is well used by the community. The spaces are sculptured by light, and I found the rhythmic expression of the bricks very meditative and conducive for prayer even for non-religious folk like myself. #dhakatrippin

Corners of busy streets usually stand a tea stand lorded over by a chaiwallah. With efficient gestures, a flick of a wrist, he (always a he) makes hot tea even for a hot day for those needing a cuppa to get through the day. Some are no more than a lean to, others even have a TV set or a bench for you to rest on. These little tea stands were my salvation, I found very little reason not to stop by one. Some shops with electricity have started to serve nescafe from little vending machines. #dhakatrippin

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফিল্ম সেন্টারের পুনর্মিলনী

গত ১৩ মে ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফিল্ম সেন্টার-এর সদস্য, বিভিন্ন সময় আয়োজিত ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারী, লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবক, চলচ্চিত্র নির্বাচন কমিটির সদস্য, প্রদর্শিত চলচ্চিত্রসমূহের নির্মাতাবৃন্দ ও জুরিদের নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উপদেষ্টা মফিদুল হক, লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ এবং উৎসব প্রোগ্রামার শরিফুল ইসলাম (শাওন)।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সেন্টারের স্বেচ্ছাকর্মী জারিন তাসনিম রোজার সঞ্চালনায় নবম, দশম ও একাদশ লিবারেশন ডকফেস্টের স্বেচ্ছাকর্মীদের অংশগ্রহণে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথমে দলীয় গান পরিবেশন করেন দশম ডকফেস্টের স্বেচ্ছাকর্মী ওহী ও তারদল। তারপর দশম ডকফেস্টের স্বেচ্ছাকর্মী সুমাইয়া একক নৃত্য পরিবেশন করেন। পরবর্তী পর্বে সাফা ও লাবণ্য যৌথ আবৃত্তি পরিবেশনা করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্বে একক নৃত্য পরিবেশন করেন একাদশ ডকফেস্টের স্বেচ্ছাকর্মী জাহরা। এরপর একাদশ ডকফেস্টের স্বেচ্ছাকর্মী প্রসেনজিৎ-এর নির্দেশনায় মঞ্চায়িত হয় বিখ্যাত ফরাসি লেখকের ছোট গল্প অবলম্বনে নাটক 'নেকলেস'। সবশেষে ফিল্ম সেন্টারের স্বেচ্ছাকর্মী জাহরা, জবা ও ফাহিমের দলীয় নাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রথমবারের মত ফিল্ম সেন্টারের পুনর্মিলনীতে স্বেচ্ছাকর্মীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আয়োজনটি করার জন্য প্রায় সাত দিন সেন্টারের সেচ্ছাসেবকরা জাদুঘরে এসে নানা সময়ে মহড়া দেয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ফিল্ম সেন্টারের কর্মী ফারহাতুল, মৃত্তিকা, আবির, আদনান, ফাহমিদা, অর্পিতা, মেহের, সায়েম, নুহান, ইয়ামিন ও অন্যান্য। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নানাভাবে দিকনির্দেশনা দেন জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই সেন্টারের কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেন্টারের পরিচালক তারেক আহমেদ। এরপর লিবারেশন ডকফেস্টের চলচ্চিত্র নির্বাচন কমিটির সদস্য শারমিন দোজা এবং সৈয়দ ইমরান হোসেন তাদের চলচ্চিত্র প্রিভিউ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শোয়েব হক ও জান্নাতুল ফেরদৌস নীলা বর্ণনা করেন ওয়ার্কশপে তারা কীভাবে নির্দেশনা পেয়েছেন এবং তারা কীভাবে তাদের প্রজেক্ট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তারা আশাবাদব্যাক্ত করেন যে এ ধরনের কর্মশালা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরও আয়োজন করবে এবং তরুণদের উৎসাহ প্রদান করবে। তারপর একাদশ লিবারেশন ডকফেস্টের সমন্বয়কারী ও স্বেচ্ছাকর্মীরা নিজেদের বক্তব্যে তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তুলে ধরেন। এসময় একটি আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উপদেষ্টা মফিদুল হক-এর নিকট থেকে ইওয়াইএফটি কর্মশালার অংশগ্রহণকারী, উৎসব সমন্বয়কারী ও স্বেচ্ছাকর্মীরা সনদ গ্রহণ করেন।

সমাপনী বক্তব্যে মফিদুল হক স্বেচ্ছাকর্মীদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যান্য প্রোগ্রামের স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কেও বলেন। জাদুঘরের জন্য স্বেচ্ছাকর্মীদের অবদান এবং ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সকল স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কীভাবে বড় পরিসরে উৎসব করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের দলীয় ফটোসেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এম. ফারহাতুল হক

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান দিলেন যারা

প্রতীকী ইটঃ	সুলতান আহমেদ মজুমদার	১০,০০০/-
	মেহা রশিদ যাকের	১০,০০০/-
	মো: ফায়েছ উল্যাহ	১০,০০০/-
আজীবন সদস্যঃ	মানস পাল	১,০০,০০০/-
	এ এস এম ফেরদৌস হাসান	১,০০,০০০/-

নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুন

প্রতীকী ইট	:	১০ হাজার টাকা
সাধারণ সদস্য	:	২৫ হাজার টাকা
আজীবন সদস্য	:	১ লাখ টাকা
উদ্যোক্তা সদস্য	:	৫ লাখ টাকা
স্থাপনা সদস্য	:	১৫ লাখ টাকা
পৃষ্ঠপোষক সদস্য	:	৫০ লাখ টাকা

প্রিয় সুহৃদ,

ভবিষ্যৎপ্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে সেই আদর্শকে প্রবাহিত করে ২৭ বছরের পথ চলা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। এই দীর্ঘ পথচলায় শুভানুধ্যায়ীদের সমর্থন ও সহযোগিতাধন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আজ আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ঠিকানায় সুবৃহৎ পরিসরে আন্তর্জাতিক মানের জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, এই মুহূর্তে প্রয়োজন ভবিষ্যতে জাদুঘর পরিচালনার জন্য এবং জাদুঘর যাতে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে তেমন একটি বড় স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা।

আপনাদের আহ্বান জানাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যপদ সম্পর্কে জানুন এবং জাদুঘরের যে কোন একটি সদস্যপদ গ্রহণ করে স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার এবং আগামীর পথ চলার অংশীদার হোন। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের সকলের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

বিশেষ অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

১৪ মে ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন অস্ট্রেলিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী Mr. Tim Watts

ঢাকা সফররত মরিশাসের রাষ্ট্রপতি পৃথ্বীরাজ সিং রুপন ১২ মে ২০২৩ শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official